Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 47 - 52
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বৌদ্ধধর্ম এবং দুইজন বাঙালি কবি : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও মণীন্দ্র গুপ্ত

জয়ন্ত পাল
গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
Email ID : pauljayanta950@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Buddhism, post-modern, root for existence, creative dimention, Treatment, Mahayani, Hinayani, Poetic transformation, Intellect of modern man.

Abstract
Buddhism is quite popular thought in the cultural history of world. In modern times particularly in the post-modern period, poets of Bengal sought for a potential and valid root for their existence in contrast to the pervaded sense of darkness and decay. Many of them took elements from Buddhism and used it to their own poetry to give it a completely new creative ever-expanding dimention. Here we discuss two poets, Alokrangan dasgupta and Manindra gupta, who did this but the treatment is different in each case. Alok is mahayani in mood whereas in manindro we can trace one kind of hinayani spirit. However in both case religion has achieved poetic fragrance and even transformed according to the intellect of modern man. We can justly say that religion is poetry now-a-days.

Discussion

১

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘কাব্যের মুক্তি’ প্রবন্ধে বলেছিলেন কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে। আধুনিক বাংলা কবিদের অনেকেই বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছেন, তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে নতুন দৃষ্টি ও মাত্রা সংযোজিত করেছেন। বাংলা কবিতার পক্ষে একথা বিশেষভাবে আরো গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য বাঙালির মধ্যে যে অনার্য পরিচয় আছে বেদপ্রাধান্য অস্বীকার করা বৌদ্ধধর্ম তাকে আত্মপরিচয়ের নতুন পথে সন্ধান দিয়েছে। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ভারতের পূর্বপ্রান্তেই। কিন্তু ‘শিকড়ের সন্ধানে বিশ শতকের সাহিত্য’ এই কথাটিকে আমরা যখন মনে রাখি তখন বুঝতে পারি উনিশ শতকের শিকড়সন্ধান আর বিশ শতকের শিকড়সন্ধান এক রকম নয়। উনিশ শতকের শিকড়সন্ধান যেখানে ছিল জাতীয়তাবাদী পরিচিতি গঠনের হাতিয়ার, আন্তর্জাতিক বিশ শতকে সেখানে বহুবিচিত্রের বিশ্বসভার মাঝে, যতই আপাত ক্ষুদ্র হোক, সম্মানিত স্থান ও আত্মমর্যাদা স্থাপনের প্রচেষ্টা। এছাড়া আধুনিকতার নেতিবাচক ক্ষয়চেতনা ও ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য বিশ শতক লোকজীবনে নিজেকে ছড়িয়ে দেখতে চেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম নিম্নবর্গকে সম্মানের স্থান দিলেও সম্পূর্ণভাবে লোকজ চিন্তা নয়। কিন্তু কবিদের শিকড়সন্ধান তাতে ব্যাহত হয় না, কারণ শিকড় কেবল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাটি থেকে নয়, আকাশ থেকেও পাওয়া যায়, আকাশের ওপারে আকাশের অমূর্ত ব্যঞ্জনা যেভাবে জীবনানন্দের ‘সুরঞ্জনা’ কবিতায় ঘাসের জন্ম দেয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও পাশ্চাত্যের অস্তিত্ববাদী দর্শনের মতন অস্তিত্বকেন্দ্রিক জিজ্ঞাসা আছে কিন্তু তার থেকেও বেশি রয়েছে আত্মজয়ের অবিশ্রাম সাধনা ও মূল্যবোধ। বস্তুত শূন্যতার দুঃখকে স্বীকার করেও আত্মনির্ভর আত্মসচেতনতায় তাকে মোকাবিলা করার বলিষ্ঠতা বৌদ্ধদর্শন ভিন্ন অন্য কোনো আধ্যাত্মিক দর্শনে দুর্লভ। আর এই শূন্যতার দুঃখ ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর বিশ্বে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নব্য-উপনিবেশতন্ত্রের বিশ্বে যখন মানুষকে পারমানবিক বোমায় শুধু দৈহিকভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় তাই নয় তার সমগ্রতা ও মূল্যযুক্ত অস্তিত্বকে রিডাকশনিস্ট দৃষ্টিতে টুকরো টুকরো করে ফেলা যায়। আমাদের দেশীয় প্রেক্ষিতে চল্লিশের দাঙ্গা-মন্বন্তর-ঝড়-মেকি স্বাধীনতার পর তদুপরি যুক্ত হয় বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজের রূপান্তরিত অর্থনৈতিক বৈষম্য, স্তরীভূত সমাজের বিপুল বৈষম্যের পরিসর ও সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় গোঁড়ামি। এই দারুণ দুঃসময়ে অনন্ত ও শাশ্বতকে আঁকড়ে ধরতে চাইলে তাকেও সমগ্রতার বোধ ছেড়ে, গতিশীল, কোয়ান্টামধর্মী হতে হয়। বৌদ্ধধর্ম আধুনিক কবির মননে সেই সুযোগটাই দিয়েছে। বিষয়নির্ভর আধ্যাত্মিকতার বদলে বিষয়ীর চেতনাজাত আধ্যাত্মিকতার সুযোগ দিয়েছে বৌদ্ধধর্ম। পঞ্চাশের কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের এই বিষয়ক যে কবিতাগুলি আমরা নির্বাচন করেছি তা হল- ‘বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে’, ‘এ বাসনা বোধিসত্ত্ব’, ‘এক বেশ্যা অনায়সে ভিতর মন্দিরে ঢুকে যায়’, ‘প্রাণী’, ‘অনাথপিন্ডদ’, ‘জাতক, অথবা জায়মান’, ‘হীনযান’, ‘নাগার্জুনের অনুচিন্তা’, ‘সিদ্ধার্থের জন্মদিন’, আর ষাটের কবি মণীন্দ্র গুপ্তের নির্বাচিত কবিতাগুলো হল- ‘অলাতচক্র’, ‘পুনর্জন্মরহিত’, ‘অমিতাভ, আমি কি’, ‘আনন্দকে তথাগত এবং আমি’, ‘বৌদ্ধ দোহা’।

২

পঞ্চাশের অলোকরঞ্জন বরাবরই মননশীল বাচনে নিপুণ। বুদ্ধ-বিষয়ক তাঁর কবিতাগুলিতেও এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বুদ্ধত্ব প্রতিটি মানুষেরই অন্তরে থাকে। বুদ্ধের উপাসনা বলতে এদিক থেকে আত্মমুক্তির সাধনা বা আত্ম-অন্বেষণ বোঝায়। সবার প্রতি ভালোবাসা, এক করুণাঘন অন্তর এর সার কথা। কিন্তু একে জাগানো সহজ নয়, জীবনের পথে রুঢ় বাস্তবতায় মানুষের সঙ্গে চলার পথে যে অপমান ও গ্লানিবোধ আমাদের অনুভব করতে হয় তাতে অভ্যস্ত হয়ে সহনশীল সহাবস্থানে আমরা অবস্থান করি, যার অন্তরসংগঠনের শরীরটিকে কবি ঘি রঙের উজ্জ্বলতায় দেখেছেন। কিন্তু ভালোবাসার ‘রাত্রির তিয়াশা’ জাগানোর জন্য কবি খরাবোধকে প্রখর করে তুলতে চান। ‘প্রাণী’ কবিতায় তাই অন্তরের সুপ্ত বুদ্ধ সেই প্রাণকে অল্প আহার দিয়ে, নির্দয়, নির্মম মানুষের সঙ্গে আরো বেশি করে মিশিয়ে তার উজ্জ্বলবর্ণকে মলিন করে ভালোবাসার জন্য সকাতর তৃষ্ণার্ত করে তুলতে চান, এমন তৃষিত অন্তরই আবার ভালোবাসা দিতে পারে। কবি শঙ্খ ঘোষ যেমন মেঘের মত মানুষের কথা বলেছিলেন অনেকটা তেমনই সেই মানুষ মগ্ন অশ্বত্থগাছ হয়ে প্রতিকূল মাটিতে থেকেও তার সজল অন্তরের ছায়া চারপাশের পরিবেশে বিছিয়ে দেয়। চারপাশের অন্তরপ্রকৃতিও তাতে প্রভাবিত হয়ে ফুল হয়ে জেগে ওঠে। হাওয়ার অঙ্গনারা তাদের অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু অপ্রেম এতই সুদূর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে যে এই ছায়াময় ফুলময় প্রাকৃতিক রুপান্তরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না, আশ্বস্ত হতে পারে না। এ অশ্বত্থের প্রেমময় বলিষ্ঠ মজ্জায় এক প্রকার আঘাতই বলা যেতে পারে, তার প্রেম, করুণা উষ্ণতায় গৃহীত হয় না বলে অপেক্ষায় অনাদরে শুষ্ক বিশীর্ণ হয়ে যায়। অবশ্য এ দুঃখ এক অন্য সাধনার ঐশ্বর্যকে সামনে নিয়ে আসে। অশ্বত্থগাছ অভিমানে তার মনের জানলা-দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার ভালোবাসার মুক্তি নিয়ে নিজেই লীন থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনা দেখা যায়। হীনযানীরা তো নিজেদের নির্বাণ নিয়েই সন্তুষ্ট। কিন্তু ‘এ বাসনা বোধিসত্ত্ব’ কবিতায় অলোক দেখান অশ্বত্থ নতুন করে আবার অন্য ফুল ফোটায়। তার বুকের হোমানলে সে ভালোবাসার ধ্যানের পাশাপাশি ভালবাসার শিক্ষাদানে, বিতরণেও কুশলী হয়ে ওঠে, তাই যে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল শেষপর্যন্ত সে তাকে ফেরায় না। হীনযানীদের আদর্শ অর্হতের মধ্যে রূপায়িত, মহাযানীদের বোধিসত্ত্বের আদর্শ আলাদা। শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানান-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "হীনযান অর্হত্ব পাইলেই খুশি, মহাযান তাতে খুশি নয়- তাহারা বুদ্ধত্ব চায়। এ দুয়ে তফাত কী? ...বুদ্ধ যখন বোধগয়ায় অশ্বত্থ গাছের তলায় সম্যক সম্বোধি লাভ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নির্বাণ লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন, সেই সময় ব্রহ্মা ও ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এখন নির্বাণ লাভ করিলে মগধের গতি কী হবে? ...তাঁহাদের কথায় বুদ্ধ স্বীকার করিলেন যে তিনি মগধের উদ্ধারের জন্য বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবেন।"[১]

বোধিসত্ত্ব হওয়ার মধ্যে এই আধুনিক অর্থে পরিস্রুত করে নিলে অলোকের কবিতার অর্থটি একটি দিককে স্পষ্ট করে। অবশ্য হীনযানী থেকে মহাযানী হওয়ার মধ্যে সত্যসন্ধানীর নিজস্ব লাভ অথবা মহত্তর স্বার্থটিও অল্প নয়। 'হীনযান' কবিতায় অলোক গিরিপথ পেরিয়ে বার্চগাছে ঘেরা এক নির্জন পাহাড়ি উপত্যকায় চলে গেছেন নিজের স্নায়ুগুলিকে বিশ্রাম দিতে। সেখানে এক বৌদ্ধ তাপস জানায়, তাকে এখানে বিরক্ত করতে আসবে না। তিব্বতী এক প্রবাদে কবি শুনেছিলেন, যদি কেউ এসেও থাকে, তবে তারা সবাই বন্ধু হবে। তার স্নায়ুগুলি তো সব নিকৃষ্ট বন্ধু বা দুর্জয় শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু পাহাড়ি এই নির্জনতা কবির স্নায়ুকে পুঞ্জিত বিশ্রামে সুস্থ করে ক্ষয়কে পূরণ করলেও শেষ পর্যন্ত কবি মানুষের সঙ্গ চান বিরুদ্ধতার মধ্যে দিয়ে, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। যদি শরীরধারণ মানেই কষ্ট এই মানে করে নির্বাণের চূড়ান্ত মানে দাঁড়ায় শরীর ত্যাগের পর শূন্যতায় বিলীন হওয়া এবং তা যদি সবারই লক্ষ্য হয় তবে এই সুন্দর মানবজন্মের পৃথিবীর কী হবে? জন্ম মানেই যদি অবিদ্যা, তৃষ্ণা ইত্যাদির ফল হয় তাহলে ইহলৌকিক জীবনকে যেভাবে সামগ্রিক পরিত্যাগ করা হয় তাতে অন্তত একটি যুক্তি একে মেনে নিতে পারে না। তাই এমন অবস্থান নেওয়া যায় শূন্যতা মূল্যবান, এই পৃথিবীও মূল্যবান, তবে তা সম্ভাব্য এক তৃষ্ণাহীন, আসক্তিহীন বিশুদ্ধ জগত। মহাযানীরা যে জগত উদ্ধারের কথা বলেন তা কোনো এক আধুনিক মনের ভাবনায় জগতের অনিবার্যতার কথাই বলে, নইলে যে জীবন্মুক্ত হওয়ার পর সকলেই শূন্যতার অভিলাষী হলে শিশুর হাসি দেখা দেখা যাবে কীভাবে? জগতের মূল্য ধরে শূন্যতারও মূল্য বাড়ে, তার শ্মশানবৈরাগ্য আর থাকে না, হীনযানী অলোক যে শেষে মানুষের ঘাতপ্রতিঘাতমুখর সঙ্গ কামনা করেছেন তা জগতের অমূল্যতার কারণেই আর তার চিন্তিত শূন্যতার ধ্যানও আরো স্নায়ুবিকভাবে গতিশীল হয়ে ওঠে। বৌদ্ধ ধর্মের শূন্যতা তো গতিশীলই, সে ক্ষণিক কিনা পরের কথা কিন্তু সে চূড়ান্তভাবে জঙ্গম। 'নাগার্জুনের অনুচিন্তা' কবিতায় কবি তাই দেখান নাগার্জুন কেবল আণবিক বিশ্বসংসারের কথা বলেননি, তার প্রতি অণু অন্য অণুর ওপর নির্ভরশীল, একের ভিতর অন্যে আছে, সেই অন্যও আবার আরেক অন্যসাপেক্ষ। বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনচিন্তাতেই এই বিশ্বসংসারকে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত তত্ত্ব হিসাবে একটি মিথুনরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কখনো পুরুষ মঞ্চে সমাগত, কখনো নারী, কিন্তু উভয়কেই প্রয়োজন, তাই অতীন বাইরে গেলে যখন মীরার পালা আসে তখন কিছুক্ষণ তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করলেও সংরাগের জ্বালায় অতীনের জন্য কাতর হয়ে ওঠে। গোলাপের লাল ঝিনুকের মধ্যে স্ফটিক আছে, গোলাপের কোমলতার ভিতর অতএব স্ফটিকের পৌরুষ, অথচ গোলাপ ও স্ফটিককে কার ওপর নির্ভরশীল, প্রধানকে এ নির্ণয় সম্ভব নয়।সৃষ্টির মধ্যেই প্রলয়, সে শুধু সৃষ্টি নয়, যাবতীয় বৈপরীত্য নিয়েই সে ছন্দিত। অথচ শূন্যের এই ছন্দময় দ্বান্দ্বিকতাকে একটি 'আবুঝি' কিশোর ভাবতে পারলেও চৈত্র প্রান্তরের অতীন ও মীরার যুক্মতার পাশেই বিধ্বংসী কারবালার অবস্থান। নাগার্জুনও জানতেন –

> "The first alternative of the tetralemma consisted of 1) a positive thesis, the second of 2) a negative counter-thesis, the third of 3) a conjunctive affirmation of the first two, the fourth of 4) a disjunctive denial of the first two."[২]

শূন্যতাকে বুঝতে না পারা এই যে কারবালার কথা বলা হয়েছে এখান থেকেই বোঝা যায় সমাজমন বহুক্ষেত্রেই বুদ্ধের শিক্ষার প্রকৃত মর্ম অনুভব করতে পারে নি, উত্তরাধিকার বহন করতে পারে নি। এই রকম দুটি কবিতা 'এক বেশ্যা অনায়াসে ভিতর মন্দিরে ঢুকে যায়' এবং 'জাতক, অথবা জায়মান'। প্রথম কবিতায় এক বেশ্যা বা নিষিদ্ধ রমণী বুদ্ধমন্দিরের দরজা যখন সন্ধ্যায় বা রাতে বন্ধ হয়ে গেছে তখন পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে বুদ্ধের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরের শ্রমণ যাতে তার অপবিত্র উপস্থিতি জানতে না পারে তার জন্য দুটি দেবদারু, জাপানি চারা পাহারা দিচ্ছে, শান্ত পরিবেশ তৈরি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে তুলেছে। তাদের সাহায্যে আর ঐ শ্রমণের ঘুমের কারণে ঐ রমণী বুদ্ধের কাছে প্রচলিত ভিক্ষুদের সম্বন্ধে কিছু বলে। কী বলে তা আমরা জানতে পারি না, তবে বুদ্ধ-প্রবর্তিত ভিক্ষু-আদর্শ যে চ্যুত হয়ে গেছে, ভিক্ষুদের চেতনা যে ঐ শ্রমণ বা গাছ-পালা-ফুলের মতনই ঘুমাচ্ছন্ন আর ইন্দ্রিয়কাতর তা হয়তো বুদ্ধকে জানানো হয়। পরিপূর্ণ চৈতন্যের প্রতীক বুদ্ধের কাছে ঐ রমণী হয়তো জানায় তার তো কেবল শারীরিক সত্তাটুকু আছে মনের অংশ ক্ষীণমাত্র, কিন্তু যাদের মন তাঁরই মতন জাগরণের পূর্ণতায় তাকে সঠিক পথ দেখাবার কথা ছিল, তার কোথায়? বুদ্ধের দর্শন একই সাথে সরল এবং গভীর, তাতে পান্ডিত্য, শাস্ত্রভার ইত্যাদি অনুপস্থিত। অধিবিদ্যা সম্পর্কিত প্রশ্নে বুদ্ধ নিজে তো সম্পূর্ণ নীরবই থাকতেন। যদিও পরে বৌদ্ধ দর্শন একটি সামগ্রিক রূপ পায় কিন্তু অনেক পরের তন্ত্র-মন্ত্র-কন্টকিত জটিল রূপের সঙ্গে তাকে মেলানো যায় না। এই জটিল অসৎ শাস্ত্রবিদদের কবি 'জাতক, অথবা জায়মান' কবিতায় 'চটুল ঋত্বিক' বলেছেন, যারা মানুষদের শিক্ষাদানের চেয়ে কাঁপায় বেশি, যাদের প্রভাবে ধর্মের উত্তুঙ্গ নির্জন পাহাড়ের দধীচির মতন আত্মত্যাগের শিক্ষা হারিয়ে যায়। ধর্মের নামে যজ্ঞ হয়, পাতার পর পাতা শাস্ত্রবাক্য লিখিত হয় কিন্তু কয়েকটি পাতার মধ্যেই যে ফুল দেখানো যায় সেই সরলার্থ বলে কেউ থাকে না, কুটিল দেবদত্তদের শিক্ষা দেবে এমন কোনো আনন্দ থাকে না। কবি তাই মনে করেছেন বোধিসত্ত্ব আবার পাখি হয়ে জন্ম নেবে, শিক্ষা দেবে কাকলির সরলতায়, আর সারাদিনের শাস্ত্রচর্চার পর শাস্ত্রবিদদের মনের আলো-অন্ধকার বা গোধূলি থেকে প্রকৃত ধর্মশিক্ষার্থীকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। বোধিসত্ত্বের পাখি হয়ে জন্মানোর এখানে এক বিশেষ মানে আছে। ব্রাহ্মণ্য শক্তি বঙ্গের অনার্যদের হেয় করার জন্য 'পাখি' বলতেন অথচ এখান থেকেই তো বৌদ্ধধর্ম উদিত হয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ওপর প্রত্যাঘাত হেনেছিল।

> "...আর্যগণ এলাহাবাদ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাহার ওদিকে বঙ্গ-বগধ-চেরজাতি। ইহারা আর্যগণের শত্রু ...যাহাদিগকে তাঁহারা দেখিতে পারিতেন না তাহাদিগকে মানুষ না বলিয়া পশু পক্ষী রাক্ষস বলা তাঁহাদের রোগ ছিল। তামিলগণ তাঁহাদের কাছে বানর... সেই রূপ বাংলার লোক পাখি।"[৩]

কেবল সমাজ নয় রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রেও বুদ্ধের শিক্ষা ভ্রান্তপথে চালিত। তাই 'অনাথপিন্ডদ' কবিতায় দেশের আদুল গা,পথবাসী, ক্ষুধিত নাগা সন্ন্যাসীদের মতন সাধারণ মানুষগুলিকে নগ্ন অসভ্যতা হিসাবে চিহ্নিত করে পোশাকি সভ্য অভিজাত ক্লীবরা সেমিনার করে, শান্তিনিকেতনে বসন্ত-উৎসব পালন করে, অথচ অনাথ ওই সাধারণ মানুষদের শ্রেণিচেতনার পরিখায় দূরে রেখেছে। চারিপাশে ঘনিয়ে এসেছে ঝড়, আঁধি আর তার একদিকে এই অভিজাত, অন্যদিকে অনাথ। তারা অনাথ এইজন্য তাদের কোনো পিতা নেই, রাষ্ট্র তাদের ছাতা দেয় না। অথচ অনাথপিন্ডদদের মতন শ্রেষ্ঠীরা বৌদ্ধযুগে অর্থনীতিকে পরহিতব্রতে কাজে লাগিয়েছিলেন। 'সিদ্ধার্থের জন্মদিন' কবিতায় দেখানো হয় ভারত বোউদ্ধধর্মের উদগাতা হতেও তার শিক্ষার উত্তরাধিকার চীন, জাপান বা তিব্বতে চলে গেছে। ভারত এখন রাজনীতির অ্যালকোহলে মজে আছে। অথচ সিদ্ধার্থ আজো জন্মায়, তাঁর পাঁজরে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে থাকে কান্দাহার, তক্ষশিলা, বরোবদুরের শিক্ষা, যা মানুষের সভ্যতাকে এক বিশেষ কল্লাদর্শে রূপ দিতে চেয়েছিল। প্রেম এবং করুণার ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মকে মানুষ-মানুষী প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে 'বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে' ও 'মানবজন্ম' কবিতায়। শরীর মানেই নশ্বর, জরা,ব্যাধি, মরণে আক্রান্ত, সেই শরীরনির্ভর মানুষী প্রেমও তাই ক্লেদে ভরপুর। অথচ 'মানবজন্ম' কবিতায় এক নারী তার ঘরোয়া নারীত্বের কোমলতায় প্রেমের ঘর করতে এসেছে। সে বুদ্ধ হতে চায় না কারণ মহাপরিনির্বাণ-এরও অগম্য প্রেমের 'ভোর-জোনাকি' আলোকে সে তার সত্তায় আবিষ্কার করতে পেরেছে। এই ভোর-জোনাকি প্রেমের শরীরনির্ভর অথচ শরীর-অতিরিক্ত মনের আলো, একই সাথে ভোরের মতন অন্ধকারকে বিদূরিত করে আবার জোনাকির মতন অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে। পুরুষ এবং নারীর শরীর পরস্পরের সান্নিধ্যে নশ্বরতাকে অতিক্রম করে প্রেমের উচ্চতর সত্যে। অথচ 'মানবজন্মতরীর মাঝি' তাকে দেখায় এক দুপুর থেকে বিকেল হয়ে হয়ে সন্ধ্যায় বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রেমের অসারতাকে, জীবন্মৃত পুরুষের পাশে নিছক শরীরী নারীকে, নপুংসক পুরুষদের অন্য নারীর প্রেমিককে নিয়ে হিংসাকে, জুয়াড়ির প্রেমিক সাজাকে।যে অন্ধকার শরীর থেকে প্রেম আলোর সন্ধানে ব্রতী হয়েছিল তা ভীষণভাবে নিরুৎসাহিত হয়, সংকটাপন্ন হয়। 'বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে' প্রেমের বাধা অবশ্য অন্যরকম। সেখানে এক ভিক্ষু কোনো এক বুদ্ধপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময় রাত্রে পরহিতব্রতে বুদ্ধের জন্ম-জন্মান্তরের অনুগামী হওয়ার কারণে নিজেকে ধন্য ও সার্থক মনে করেছে। ঠিক সেই সময় অহল্যার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থেকেও বেশি অপেক্ষা করে থাকে ও গৌরীর চেয়েও বেশি তপস্যা করে থাকা এক নারী তাকে তার প্রকৃত পরিচয় স্মরণ করতে বলে। পুরুষটি অবশ্য তার বর্তমান জীবনের স্বতন্ত্র নামটি মনে রেখে বলতে পারে না, কিন্তু সে যে পূর্বজন্মে আনন্দ ছিল তা বলে। পূর্বজন্মে আনন্দ হওয়ার অর্থ সেই নির্দিষ্ট আনন্দ হওয়া নয়, বুদ্ধের অনুগত প্রিয় শিষ্য হওয়াটাকেই বেশি করে বুঝতে হবে। সেই নারী পুরুষটিকে তার নিজের প্রেমিক সত্তার পরিচয়টিকে জাগাতে বলে, কিন্তু তার প্রচেষ্টায় সে ব্যর্থ হয়। এতে প্রথমে তার ভ্রুতে, চোখে ক্রোধের অগ্নিকণা সঞ্চারিত হয়। কিন্তু পরে সেই চোখেই করুণার জল দেখা যায়, পুরুষটিকে বলে তার ভিক্ষু হওয়ার ব্রতে সে নিজের ছোট্ট মধুর কামনাময় জিবনে কী পেল। পুরুষটি প্রেমের আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয়ে পূর্বজন্মের আনন্দ হতে পারে, কিন্তু নারীটিও কম নয়, সে পূর্বজন্মের সুজাতা, যে সাধনার সত্যকে সত্য পথ দেখিয়েছিল। সন্ন্যাসের আদর্শ পূর্ণ হতে পারে কিন্তু শুদ্ধ প্রেমের আদর্শ তত্ত্বগতভাবে তার বিরোধী হওয়ার কথা নয়।

৩

মণীন্দ্র গুপ্ত প্রেমের ক্ষেত্রে সন্ন্যাস কিংবা শরীরের আদর্শের বিরোধ ঘটাতে চান নি। বরং প্রেমের গৃহীরূপে বৌদ্ধ ধর্ম তাকে আশ্রয় দিয়েছে, প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়েছে, কারণ আমাদের জীবনকে স্থলরূপকে বেষ্টন করে আছে যে তিনভাগ জল বা সমুদ্র সেখানে উচিত-অনুচিতের বোধ নেই। দুপুরে সমুদ্রে স্নান করতে নামলে জলবরুণের কামুক উঁকিঝুঁকি নজরে আসে।শিশু মারের স্বর গান হয়ে ভেসে আসে। 'মার' এখানে শিশুরূপে অমর্ত্য প্রেমের মধ্যে মোহ-মায়ার বিষ সঞ্চারিত করে। অর্থাৎ প্রেমের সংস্কৃত রূপ এখানে নেই, আমিষ গন্ধ এখানে। কবি তাই এই প্রতিকূল স্থান ত্যাগ করতে চান, চলে যেতে চান স্থলভাগের ভিতরে, সংস্কৃতির মধ্যে, ছত্রপলাশ চৈত্যে। এখানে থেকেই অর্হতের কাছে এবারের বসন্তটা কাটাবেন। খেয়াল করতে হবে তিনি অর্হতের কাছে বসন্ত কাটাবেন, অর্হত বোধিসত্ত্বের মতন জগতের মুক্তি নিয়ে ব্যস্ত নয়, তাই তাকে গৃহী প্রেমিকেরই কোনো বিশুদ্ধ আদর্শ শেখান হবে এমনটা বোঝাই যায়। বস্তুত মণীন্দ্র গুপ্তের বৌদ্ধ আদর্শ অলোকরঞ্জনের মহাযানী বৌদ্ধ আদর্শ থেকে পৃথক। অলোক 'হীনযান' কবিতায় মানুষের সঙ্গ চেয়েছেন, 'এ বাসনা বোধিসত্ত্বের' কবিতায় তার বাসনাও বোধিসত্ত্বের, কিন্তু মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'আনন্দকে তথাগত এবং আমি' কবিতায় দেখিয়েছেন তথাগত শিক্ষাদানে ক্লান্ত, প্রিয়তম শিষ্য আনন্দকে তিনি শিক্ষাদানের দায়িত্ব দিয়ে নিজে একটু বিশ্রাম নিয়ে পিঠটাকে আরাম দিতে চান। এ বুদ্ধ ঠিক স্বার্থপর না হলেও শিক্ষাদান, সংসার উদ্ধারের সরবতায় থাকতে চান না, বরং তাঁর অন্বেষণ এক মগ্নতা, নিভৃতি, নির্জনতা। তথাগতের সেই আদর্শে কবিরও সায় আছে। কবিও আনন্দকে 'মজ্ঝিমনিকায়'-খানি বন্ধ করতে বলেছেন যাতে আড়াই হাজার চৈত্র,তার সন্ধ্যা, বিকাল, রাত্রির জাগ্রত আনন্দমুহূর্ত ও অনুভূতির শিহরণ ছেড়ে তিনি ঘুমাতে পারেন। মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'অমিতাভ, আমি কি' কবিতায় অমিতাভের প্রসঙ্গ এনেছেন। এই অমিতাভ বৌদ্ধ ধর্মে বিশিষ্ট ও বিখ্যাত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছেন –

> "মহাযানেও শাক্যসিংহের মূর্তি বিহারে বিহারে থাকিত। তাঁহারা উহাকে নির্বাণ লাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমে একটি একটি করিয়া ধ্যানীবুদ্ধ আসিতে লাগিল। প্রথম 'অমিতাভ', তারপর 'অক্ষোভ্য', তারপর 'বৈরোচন', তারপর 'রত্নসম্ভব', তারপর 'অমোঘসিদ্ধি' আসিয়া জমিলেন ...বর্তমান কল্পে অর্থত ভদ্রকল্পে 'আমিতাভ' প্রধান ধ্যানীবুদ্ধ। তাঁহার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর-প্রধান বোধিসত্ত্ব।"[৪]

এই অমিতাভকে কবি 'অমিতাভ, আমি কি' কবিতায় ইলোরার ভাস্কর্য নির্মাণে ব্যস্ত এক হাতুড়ি-ছেনিধারী শ্রমিকের চেতনা হিসাবে দেখেছেন। সে বারবার জন্মেছে আর মরেছে, তার পেশীতে রয়ে গেছে সেই স্মৃতি, সে তার শিল্পকর্মের পরিশ্রমকে শূন্যতার হাতেই সঁপে দিতে চায়। পশ্চিমঘাটের শুষ্ক স্থাণু পাথরের বদলে সে এবার তুলে নিয়েছে জল-হাওয়া মাখানো পাথর যাতে শূন্যতারূপ অনন্ত লেগে আছে। তার পরিশ্রমী দিনগুলি রাতের চেয়ে বড় মনে হয়। একটা সময় তাঁর মনে হয় ছেনির ওপর হাতুড়ির আঘাতই অমিতাভ, এই গুহা রাজার কারণে না ঈশ্বরের কারণে সে বুঝতে চায় না। সে নিজের মত অমিতাভ কী বুঝে নিয়েছে, এবং ঠিক বুঝেছে কিনা অমিতাভের কাছেই জানতে চেয়েছে। ঠিক এখানে এসে মণীন্দ্র গুপ্ত বিপ্লবসাধন করলেন বলা যায়। অলোকরঞ্জনের বৌদ্ধধর্মে নিম্নবর্গের স্থান এসেছে 'এক বেশ্যা অনায়াসে ভিতর মন্দিরে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঢুকে যায়' অথবা 'অনাথপিন্ডদ' কবিতায় অথচ এই কবিতায় এক শ্রমিকের শ্রমচেতনায় বৌদ্ধধর্ম হাজির, তার কারুণ্যের বিস্তারনীতিতে নয়, 'বিজ্ঞান' অথবা চেতনার নিজস্ব মৌলিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাখ্যায়। অলোকরঞ্জনের সঙ্গে পার্থক্য খুঁজতে গেলে আরেকটি দিক বলতে হয় এই যে অলোক বুদ্ধের সঙ্গে সাদৃশ্যে, নৈকট্যে একাত্ম হতে চেয়েছেন, মণীন্দ্র গুপ্তও চেয়েছেন কিন্তু তাঁর 'আমি' সর্বদাই সমান্তরাল ভাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেয়েছে। আধুনিক কবিরা বৌদ্ধ ধর্মের জন্মান্তরকে খারাপ কিছু মনে করেন নি বরং জন্মান্তর প্রার্থনীয়, মহাপরিনির্বাণে সবাই শূন্যে মিশে গেলে জগত থাকে না এমন চূড়ান্ত ইহলোকবিরোধী চিন্তা আধুনিক মননে সমর্থন পেতে পারে না। তাই 'বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে' অলোকরঞ্জন জন্ম-জমান্তরের কথা বলেন, 'অমিতাভ, আমি কি'-তেও মণীন্দ্র গুপ্ত জন্মান্তরের কথা বলেন, নির্বাণ নামক কোন মহামুক্তির কাছে তাকে ছোটো না করেই। 'পুনর্জন্মরহিত' কবিতায় মণীন্দ্র গুপ্ত দেখান পুনর্জন্মরহিত একটি আত্মাকে অনন্ত শূন্যে কোন এক ছায়াময় পুরুষ বলছেন তার আর জন্ম হবে না এবার সে চোখ বন্ধ করে ঘুমাক। কিন্তু সেই আত্মা তখন চোখ বন্ধ করে ঘুমায় না, চোখ খুলেই থাকে, সে তখন একটা শিশু হয়ে চুপচাপ অনন্তের বুকে শুয়ে আছে। আমাদের এই শিশুটিকে প্রয়োজন, একে আমরা চাই, একে অবিদ্যার কারণে বিজ্ঞান হয়ে মাতৃগর্ভে বেড়ে উঠতে দিতে ধার্মিকের আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু আমরা তাকে জন্মান্তরের চক্রে পুনর্বার নিয়ে আনতে চাই। তবে অবিদ্যায় নয় বিদ্যায় হোক এ জন্ম। আসলে এই জীবনেই একইসাথে পরলোক ও ইহলোক রয়েছে। তাই 'অলাতচক্র' কবিতায় কবি এই জীবনের আবাসকে গ্র্যান্ড হোটেলের রূপকে দেখেছেন, এই জন্ম দুদিনের পান্থশালা বই তো নয়। আবার সেই হোটেলের পাশে একটি ধোপাখানার কথা বলে একে পরকাল হিসাবেও দেখিয়েছেন কারণ পরকালের আস্তানায় প্রবেশের আগে আমরা জানি ধোপার ঘাট থাকে। আসলে দীর্ঘজীবনেই তো নানা পর্ব-পর্বান্তরে ইহলোক-পরলোকের পরম্পরা থাকে। কিন্তু গ্র্যান্ড হোটেলের আস্তানায় একটি ছায়াময় ঘরে যেখানে এক পরিচারিকা সারাদিন টিভির সামনে বসে থাকে সেখানে এই ভবচক্রের অধীন কবিতার নায়কটিকে কবি পণ্যসভ্যতার ভোগবিলাসের পুণ্য ভোগ করতে দেখেন। টিভি, ফিল্ম ইত্যাদির গতিময় বিশ্বায়নের রঙিন দুনিয়ার এই অলাতচক্রকে কবি আক্রমণ করেছেন, যেখানে সুখভোগ থেকে পাপ আবার তার থেকে আরো সুখভোগের সাজা চলতে থাকে। ম্যাথু আর্নল্ড যথার্থই বলেছিলেন ধর্ম বলে একসময় যা ছিল তা বর্তমান যুগে কবিতার তাৎপর্যে গৃহীত হবে।

Reference:

১. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, *হীনযান ও মহাযান*, বিষয় : বৌদ্ধধর্ম, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৪২
২. Singh, Jaideva, *An introduction to Madhyamaka Philosophy*,Fifth reprint,Delhi, Motilal Banarsidass, 2016, p. 16
৩. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, *কোথা হইতে আসিল?*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
৪. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, *বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২ – ৬৩